بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ মোতাবেক ১৬ তাবুক, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ প্রেক্ষিতে 'যিম্মি'দের অধিকার সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। 'যিম্মি' ছিল সেসব লোক যারা ইসলামী সরকারের আনুগত্য মেনে নিয়ে নিজেদের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল আর ইসলামী সরকার তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের বিপরীতে তাদের সামরিক দায়িত্ব পালন না করার বিষয়ে তারা স্বাধীন ছিল আর যাকাতও তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। তাই তাদের প্রাণ ও সম্পদ এবং অন্যান্য মানবাধিকারের সুরক্ষার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে একটি সামান্য কর আদায় করা হতো, যেটিকে সাধারণ পরিভাষায় 'জিযিয়া' বলা হয়। এর পরিমাণ ছিল মাথাপিছু বার্ষিক চার দিরহাম আর এটি কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদায় করা হতো। বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, সহায়সম্বলহীন এবং শিশুরা এটি থেকে মুক্ত ছিল। বরং বিকলাঙ্গ ও দরিদ্রদের ইসলামী বায়তুল মাল থেকে সাহায্য করা হতো। ইরাক ও সিরিয়ার বিজয়াভিযানে বহু গোত্র এবং জনবসতি জিযিয়া প্রদানের ভিত্তিতে ইসলামী প্রজা হওয়ার মর্যাদা পায়। তাদের সাথে যেসব চুক্তি হয়েছে তাতে এরূপ ধারাও রাখা হয়েছে যে, তাদের খানকাহ্ ও গির্জাসমূহ ধূলিস্মাৎ করা হবে না। আর তাদের এমন কোন দুর্গও ভূপাতিত করা হবে না যাতে তারা প্রয়োজনের সময় শত্রুদের মোকাবিলায় আশ্রয় নেয়। শঙ্খ বাজানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে না আর ধর্মীয় উৎসবের দিন ক্রুশ বের করার ক্ষেত্রেও বাধা দেয়া হবে না; অর্থাৎ তারা ক্রুশ নিয়েও শোভাযাত্রা করতে পারবে।

হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে হীরাবাসীদের সাথে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন তাতে অন্যান্য বিষয় ছাড়া এটিও অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি, যে কর্মক্ষম থাকে না অথবা যার ওপর কোন ব্যাধি বা বিপদ আপতিত হয় কিংবা যে পূর্বে ধনী ছিল কিন্তু পরবর্তীতে এতটা দরিদ্র হয়ে যায় যে, তার স্বধর্মীরা তাকে ভিক্ষা প্রদান করে, তার জিযিয়া মওকুফ করে দেয়া হবে, অর্থাৎ (জিযিয়া) তুলে দেয়া হবে। আর যতদিন সে 'দারুল হিজরত' এবং 'দারুল ইসলামে' বসবাস করবে, অর্থাৎ যেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে বসবাস করবে, তার ও তার পরিবার পরিজনের ব্যয়ভার মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে পূরণ করা হবে। তবে এমন লোকেরা যদি 'দারুল হিজরত' ও 'দারুল ইসলাম' ছেড়ে বাহিরে চলে যায়, অর্থাৎ অন্য দেশে চলে যায়, তাহলে তাদের পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব

মুসলমানদের ওপর বর্তাবে না। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হীরাবাসীদের সাথে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ-এর চুক্তিতে লিপিবদ্ধ ছিল যে, অভাবী, বিকলাঙ্গ এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের জিযিয়া দিতে হবে না।

অতঃপর কুরআন সংকলন করা অনেক বড় একটি কাজ যা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগে সম্পাদিত হয়েছে। কুরআন সংকলন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র স্বর্ণালী যুগের অতুলনীয় ও মহান এক কীর্তি। এটি মুসায়লামা কাযযাবের সাথে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত। ইয়ামামার যুদ্ধে ১২০০ মুসলমান শহীদ হয়। আর তাদের মাঝে জ্যেষ্ঠ সাহাবী এবং কুরআনের হাফেযদেরও একটি বংড় সংখ্যা ছিল। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শহীদ হাফেযদের সংখ্যা ৭০০ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। অতএব এরূপ পরিস্থিতিতে পবিত্র কুরআনকে এক স্থানে সংকলনের করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত উমরের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেন। তিনি হযরত আবু বকরের কাছে এর উল্লেখ করেন যার বিস্তারিত সহীহ্ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উবায়েদ বিন সিব্বাক বর্ণনা করেন যে, হযরত যায়েদ বিন সাবেত বলেন, ইয়ামামাবাসীদের সাথে যুদ্ধের পর হযরত আবু বকর তাকে ডাকেন। (তিনি বলেন,) আমি দেখি, হযরত উমর বিন খাত্তাবও তাঁর কাছে বসে আছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, উমর আমার কাছে এসেছেন আর তিনি বলেছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে পবিত্র কুরআনের বহু হাফেয শহীদ হয়ে গেছেন, আর আমার ভয় হলো বিভিন্ন যুদ্ধে বহু ক্বারী বা কুরআনের হাফেয শহীদ হবেন, যার ফলশ্রুতিতে পবিত্র কুরআনের অনেকটা অংশ নষ্ট হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই হযরত উমর পবিত্র কুরআন একত্রিত করার নির্দেশ জারি করতে বলছেন। হযরত আবু বকর হযরত যায়েদকে বলেন, আমি উমরকে বলেছি যে, তুমি সেই কাজ কীভাবে করবে যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) করেন নি? তখন উমর বলেন, খোদার কসম, এই কাজে কল্যাণই কল্যাণ নিহিত। উমর এই কথা আমাকে এতবার বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের প্রতি আমার হৃদয়েও প্রেরণা সঞ্চার করেছেন আর আমিও উমরের সাথে সহমত হই। হযরত যায়েদ বলেন, হযরত আবু বকর বলেন, হে যায়েদ! নিশ্চয় তুমি একজন যুবক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর আমরা তোমাকে কোন অপবাদ অথবা দুর্বলতা থেকে পবিত্র মনে করি। তুমি মহানবী (সা.)-এর জন্য ওহীও লিপিবদ্ধ করতে। অতএব, এখন তুমি পবিত্র কুরআনকে খুঁজে খুঁজে সেটিকে একত্রিত কর। হযরত যায়েদ বলেন, খোদার কসম, যদি তিনি কোন পাহাড়কে স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করতেন তাহলে তা আমার জন্য পবিত্র কুরআনকে একত্রিত করার চেয়ে অধিক কঠিন হতো না। এটি অনেক বড় দায়িত্ব ছিল যা আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। আমি নিবেদন করি, আপনারা সেই কাজ কীভাবে করতে পারেন যা রসূলুল্লহ্ (সা.) করেন নি? হযরত আবু বকর বলেন, খোদার কসম, এই কাজ পুরোটাই কল্যাণ। হযরত আবু বকর এতবার এই কথা পুনরাবৃত্তি করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়কেও সেই বিষয়ের জন্য প্রশস্ত করেন, যার প্রেরণা তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের হৃদয়ে সঞ্চার করেছিলেন। অতএব আমি পবিত্র কুরআনের অনুসন্ধান আরম্ভ করি এবং সেটিকে খেজুরের শাখা ও সাদা পাথর এবং

মানুষের স্মৃতি থেকে একত্রিত করি। এমনকি সূরা তওবার শেষ অংশ আমি হযরত আবু খুযায়মা আনসারীর কাছ থেকে পাই যা তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে পাইনি, আর তা হলো–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم এখান থেকে নিয়ে সূরা তওবার শেষ পর্যন্ত। অতঃপর পবিত্র কুরআনের এই লিখিত পাণ্ডুলিপি হযরত আবু বকর (রা.)'র ইন্তেকাল অবধি তাঁর কাছেই থাকে। এরপর হযরত উমর (রা.)'র জীবদ্দশায় তাঁর কাছে থাকে। এরপর হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)'র কাছে সুরক্ষিত থাকে।

ইমাম বাগভী নিজ পুস্তক শারাহুস্ সুন্নাহ্-তে কুরআন সংকলন-সংক্রান্ত হাদীসসমূহের টীকা লিখতে গিয়ে বলেন, যে কুরআনকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রসূল (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন, সেটিকে সম্মানিত সাহাবীরা হুবহু সেভাবেই কোন কমবেশি না করে পরিপূর্ণভাবে একত্রিত করেছিলেন। আর সাহাবীদের পবিত্র কুরআন একত্রিত করার কারণ হাদীসেও এটি বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্বে পবিত্র কুরআন খেজুরের শাখা, পাথরের স্লেট, পাথরের টুকরো এবং সম্মানিত হাফেযদের হৃদয়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। সাহাবীদের শঙ্কা হয় যে, হাফেযদের শাহাদাতের কারণে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ নষ্ট না হয়ে যায়! তাই তারা হযরত আবু বকরের সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁকে পবিত্র কুরআনকে এক স্থানে সংকলনের পরামর্শ দেন। এই কাজ সমস্ত সাহাবীর ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয়েছে। সুতরাং তারা পবিত্র কুরআনকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়া যেভাবে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছিলেন ঠিক সেভাবেই বিন্যস্ত করেন। মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে পবিত্র কুরআন শুনাতেন। আর তাদেরকে ঠিক সেই ধরাবাহিকতায় কুরআন শেখাতেন যেভাবে এটি এখন আমাদের সামনে পুস্তকাকারে রয়েছে। এই ধারাবাহিকতা জিব্রাঈল মহানবী (সা.)-কে শিখিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার পর বলতেন যে, এই আয়াতকে অমুক সূরাতে অমুক আয়াতের পর লিখিয়ে দিন।

পবিত্র কুরআন সংকলন করার কাজ হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে সম্পাদিত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি পবিত্র কুরআনকে সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে সংরক্ষণ করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কুরআন সংকলন করা সম্পর্কে বলেন, "যে কাজ তখন পর্যন্ত হয় নি তা শুধু এটুকুই যে, পবিত্র কুরআন এক গ্রন্থ হিসেবে সংকলিত হয় নি। যখন কুরআনের এই পাঁচশ' হাফেয যুদ্ধে, অর্থাৎ ইয়ামামার যুদ্ধে নিহত হন, তখন হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে যান এবং গিয়ে বলেন; 'এক যুদ্ধেই পাঁচশ' কুরআনের হাফেয শহীদ হয়েছেন অথচ এখনও আমাদের সামনে অনেক যুদ্ধ পড়ে আছে। যদি আরও হাফেয শহীদ হয়ে যান তাহলে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে মানুষের হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। তাই কুরআনকে এক খণ্ডে সংকলন করা উচিত।' হযরত আবু বকর (রা.) প্রথমে এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু অবশেষে তাঁর কথা মেনে নেন। হযরত আবু বকর (রা.) একাজের জন্য যায়েদ বিন সাবেতকে নিযুক্ত করেন,

যিনি মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় পবিত্র কুরআনের লিপিকার ছিলেন; একইভাবে তার সাহায্যার্থে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিযুক্ত করেন। যদিও হাজার হাজার সাহাবী পবিত্র কুরআনের হাফেয ছিলেন, কিন্তু পবিত্র কুরআন লেখার সময় হাজার হাজার সাহাবীকে সমবেত করা অসম্ভব ছিল। এজন্য হযরত আবু বকর (রা.) নির্দেশ প্রদান করেন, পবিত্র কুরআন লিখিতাকারে বিদ্যমান বস্তু হতে প্রতিলিপি করা হোক, পাশাপাশি এই সতর্কতাও যেন অবলম্বন উচিত যে, অন্ততপক্ষে আরও দু'জন কুরআনের হাফেয সেটির যেন সত্যায়ন করেন। সুতরাং চামড়া ও হাড়গোড়ের টুকরোতে পবিত্র কুরআনের যেসব অংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল সেগুলো একস্থানে সংকলন করা হয় এবং পবিত্র কুরআনের হাফেযগণ সেগুলোর সত্যায়ন করেন। যদি পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে, তবে তা শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু এবং এই কাজের মধ্যবর্তী সময়টুকু সম্পর্কে হতে পারে। কিন্তু কোন বিবেকবান মানুষ কি একথা মানতে পারে- যে গ্রন্থ দৈনিক পাঠ করা হতো এবং যে গ্রন্থ প্রতি রমযানে হাফেযগণ উচ্চস্বরে পাঠ করে অন্য মুসলমানদের শোনাতেন এবং যে গ্রন্থের পুরোটা হাজার হাজার মানুষ আদ্যোপান্ত মুখস্ত করে রেখেছিল এবং যে গ্রন্থ এক খণ্ডে সংকলিত না থাকলেও বহু সাহাবী তা লিখে রাখতেন এবং খণ্ড খণ্ড আকারে লেখা সেসব লিপির সবগুলোই বিদ্যমান ছিল- সেগুলোকে এক খণ্ডে সংকলিত করতে কারও বেগ পেতে হতো? আর এমন এক ব্যক্তিকে কি এজন্য বেগ পেতে হতো যিনি স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং নিজেও এর হাফেয ছিলেন? আর কুরআন যেহেতু দৈনিক পাঠ করা হতো, সেক্ষেত্রে এটি কি সম্ভব যে, এই সংকলিত পাণ্ডুলিপিতে কোন ভুল হবে আর অন্যান্য হাফেয সেটি ধরতে পারবেন না? যদি এরূপ সাক্ষ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রমাণই আর অবশিষ্ট থাকে না! প্রকৃত সত্য হলো, পৃথিবীর এমন কোন রচনা এরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান নেই, যেরূপ নিরবচ্ছিন্নতার সাথে পবিত্র কুরআন বিদ্যমান রয়েছে।" এর পরে তিনি (রা.) এবিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, পবিত্র কুরআন আদি-অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং এতে কোন পরিবর্তন হয় নি; যেমনটি আপত্তি করা হয় যে, অমুক-অমুক পরিবর্তন হয়েছে; বর্তমান যুগেও এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়- এটি তার উত্তর।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি আপত্তির খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন: "একটি আপত্তি এটি করা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে পুরো কুরআন লেখা হয় নি। এর উত্তর হলো- এ কথাটি সঠিক নয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে অবশ্যই পুরো কুরআন লেখা হয়েছিল। [যারা একথা বলে যে লেখা হয় নি, এটি ভুল; লেখা হয়েছিল।] যেমনটি হযরত উসমান (রা.)'র রেওয়ায়েত রয়েছে, যখন (কুরআনের) কোন অংশ অবতীর্ণ হতো, তখন মহানবী (সা.) লিপিকারকদের ডাকতেন এবং বলে দিতেন, **'এটি অমুক স্থানে সন্নিবেশিত করো।'** এই ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একথা বলা চরম নির্বুদ্ধিতা যে, **'মহানবী (সা.)-এর যুগে সম্পূর্ণ কুরআন লেখা হয় নি'**। বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, হযরত আবু বকরের যুগে কেন লেখা হলো? এর উত্তর হলো, মহানবী (সা.)-

এর যুগে পবিত্র কুরআন এখনকার মতো একখণ্ডে (সংকলিত) ছিল না। হযরত উমর (রা.)'র মনে এই ভাবনা জাগে, লোকেরা যেন এটি মনে না করে যে, পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত নেই। এজন্য তিনি এ সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-কে যা বলেছিলেন তা হলো, **انی اری ان تامر جمع القران** (উচ্চারণ: ইন্নী আরা আন তা'মুরা জাম'আল্ কুরআন)। অর্থাৎ, **আপনি কুরআনকে একটি গ্রন্থরূপে সংকলন করার নির্দেশ প্রদান করুন- আমি এটিই যুক্তিযুক্ত মনে করি**। এ কথা বলেন নি যে, আপনি এটি লিপিবদ্ধ করান। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) যায়েদকে ডেকে বলেন, কুরআন সংকলন করো। যেমন বলেন, **اجمعه** (ইজমা'হু)। অর্থাৎ, এটিকে একস্থানে সংকলন করো; এ কথা বলেন নি যে, এটি লিখে নাও। মোটকথা, শব্দাবলী স্বয়ং বলছে; সে সময়ে কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো একস্থানে একত্রিত করার প্রশ্ন ছিল; লেখার প্রশ্ন নয়। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে পবিত্র কুরআনকে একখণ্ডে সংকলিত করা হয় এবং পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে যে অগ্রগতি হয় তা হলো, সমগ্র আরবকে বরং গোটা মুসলিম বিশ্বকে অভিন্ন ক্বিরাআত বা পঠন রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অতএব, হযরত উসমান (রা.)'র যুগে পবিত্র কুরআনের এশায়াত বা প্রসারের ব্যাপারে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

"হযরত আবু বকর (রা.)'র পর হযরত উসমান (রা.)'র যুগে অভিযোগ আসে যে, বিভিন্ন গোত্রের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ক্বিরাআতে পবিত্র কুরআন পাঠ করে; অ-মুসলমানদের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তারা মনে করে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন নুসখা বা পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এই ক্বিরাআতের বা পঠন রীতির অর্থ হলো, কোন গোত্র কোন অক্ষরকে যবর দিয়ে পাঠ করে, অপর গোত্র যের দিয়ে পাঠ করে, তৃতীয় গোত্র পেশ দিয়ে পাঠ করে। আর এই পঠনরীতি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায় না। এজন্য আরবী সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি যখন এটি শুনবে সে মনে করবে, এ কিছু বলছে আর সে অন্য কিছু বলছে, অথচ উভয়ে একই কথা বলছে। কাজেই, এই বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষার জন্য হযরত উসমান (রা.) এই পরামর্শ প্রদান করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-র যুগে (কুরআনের) যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল বা সংকলন করা হয়েছিল এর কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করা হোক এবং তা বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হোক; আর এই নির্দেশ প্রদান করা হোক যে, এখন থেকে এই ক্বিরাআত বা পঠন রীতি অনুযায়ী কুরআন পড়তে হবে আর অন্য কোন ক্বিরাআতে পড়া যাবে না। হযরত উসমান (রা.) যেকথা বলেছিলেন তাতে আদৌ দোষের কিছু ছিল না। মহানবী (সা.)-এর যুগে আরবের লোকেরা গোত্রবদ্ধ জীবন যাপন করতো। অর্থাৎ, প্রত্যেক গোত্র অন্য গোত্র থেকে পৃথক বসবাস করতো। এজন্য তারা নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় অভ্যস্ত ছিল। অর্থাৎ, তাদের (কথা) বলার নিজস্ব ভঙ্গি বা রীতি ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর হাতে সমবেত হয়ে আরবের লোকেরা সভ্য হয়ে উঠে এবং একটি কথ্য বা আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষা একটি পড়ালেখার ভাষা বা জ্ঞানগর্ভ ভাষায় পরিণত হয়। বিপুল সংখ্যক

আরবের লোকেরা পড়ালেখা শিখে, যে কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি সে যে গোত্রের সাথেই সম্পর্ক রাখুক না কেন, যেভাবে পড়ালেখার ভাষায় সেটা বলা হয়ে থাকে একই স্বাচ্ছন্দ্যে সেই শব্দ উচ্চারণ করতে পারতো । যা প্রকৃতপক্ষে সারা দেশের ভাষা ছিল। যখন গোটা দেশের মানুষজন একটি পড়ালেখার ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তখন আর তাদেরকে স্ব-স্ব গোত্রীয় উচ্চারণে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে থাকার অনুমতি দেয়ার আর এভাবে অন্যান্য জাতির জন্য হোঁচট খাওয়ারও কারণ হবে– এর কোন যৌক্তিকতা ছিল না । কাজেই, হযরত উসমান (রা.) এসব হরকত (বা যের-যবর-পেশ) দিয়ে পবিত্র কুরআন লিখে যা মক্কার ভাষা অনুযায়ী ছিল, সমস্ত দেশে প্রতিলিপি বিতরণ করান এবং ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশ দেন যে, মক্কার উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কোন গোত্রীয় উচ্চারণে যেন কুরআন পড়া না হয়। এই বিষয়টি না বোঝার কারণে ইউরোপের লেখক এবং অন্যান্য দেশের লেখকেরা সবসময় এই আপত্তি উত্থাপন করতে থাকে যে, হযরত উসমান (রা.) নতুন কোন কুরআন প্রণয়ন করেছিলেন অথবা উসমান কুরআনে নতুন কোন পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় সেটিই যা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন মাতলু ওহী তথা পঠনীয় ওহী এবং পুরোটাই এমনকি নোকতা ও অক্ষর সবই সুনিশ্চিৎভাবে নিরবিচ্ছিন্নরূপে চলে আসছে। আল্লাহ্ তা'লা এটিকে ফেরেশতাদের তত্ত্বাবধানে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় অবতীর্ণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)'ও কোন ত্রুটি করেন নি এবং তিনি নিজের চোখের সামনে একেকটি আয়াত যেভাবে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে হুবহু সর্বদা সেভাবেই লিপিবদ্ধ করাতেন যতক্ষণ না তিনি এটিকে পূর্ণাঙ্গীনভাবে একত্রিত করিয়েছেন। আর তিনি স্বয়ং আয়াতসমূহকে বিন্যস্ত করিয়েছেন ও সংকলন করিয়েছেন। এছাড়া নিয়মিতভাবে নামাযে এবং নামাযের বাইরেও এগুলো তিলাওয়াত করিয়েছেন, যতক্ষণ না তিনি (সা.) এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর সর্বোত্তম বন্ধু ও প্রেমাস্পদ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে ফিরে গেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অতঃপর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) পবিত্র কুরআনের সকল সূরাকে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শ্রুত বিন্যাস অনুযায়ী একত্র করার ব্যবস্থা করেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র পর আল্লাহ্ তা'লা তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-কে সুযোগ দিয়েছেন। তিনি কুরায়েশদের ভাষা অনুযায়ী পবিত্র কুরআনকে অভিন্ন ক্বিরাআতে সংকলন করেন এবং সেটিকে সব দেশে ছড়িয়ে দেন।

একটি প্রশ্ন হলো, **সহীফা সিদ্দিকী** তথা হযরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কুরআনের যে কপিটি লিখিয়েছিলেন তা কতদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত যায়েদ বিন সাবেতের মাধ্যমে যে কুরআন এক খণ্ডে সংকলন করিয়েছিলেন তাকে 'সহীফা সিদ্দিকী'ও বলা হয়ে থাকে। এটি হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। এরপর সেটি হযরত উমর (রা.)'র হাতে চলে আসে এবং হযরত উমর (রা.) এটি উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার কাছে সোপর্দ করেন এবং বলেন, এটি যেন কাউকে দেয়া না হয়।

যদি কেউ অনুলিপি করতে চায় বা নিজের অনুলিপির সংশোধন করতে চায়, সে এটি থেকে উপকৃত হতে পারে বা ব্যবহার করতে পারে। যাহোক, হযরত উসমান (রা.) তার খিলাফতকালে হযরত হাফসার কাছ থেকে এটি ধার নিয়ে কিছু অনুলিপি প্রস্তুত করিয়ে এটি হযরত হাফসাকে ফেরত দিয়ে দেন। মারওয়ান যখন ৫৪ হিজরী সনে মদিনার শাসক নিযুক্ত হন তখন তিনি হযরত হাফসার কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের এই কপিটি নিতে চান, কিন্তু হযরত হাফসা দিতে অস্বীকৃতি জানান। হযরত হাফসা (রা.)'র ইন্তেকালের পর মারওয়ান হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)'র কাছ থেকে নিয়ে সেটি নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু এর আগেই হযরত উসমান (রা.) এটি সংরক্ষণ করে ফেলেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সর্বপ্রথম যেসব কাজ সম্পাদন করেছেন বা সর্বাগ্রে যেসব কাজ তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোকে **'আওয়ালিয়্যাতে আবু বকর'** নাম দেয়া হয়েছে। এমন বিভিন্ন কাজ ও বিষয় আছে যা তিনি সর্বাগ্রে করেছিলেন। যেমন, তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়, মক্কায় সর্বপ্রথম তিনি নিজ ঘরের সামনে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। তৃতীয়, মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সপক্ষে সর্বপ্রথম তিনি মক্কার কুরায়েশের সাথে লড়াই করেছেন। চতুর্থ, অনেক দাস-দাসী যারা ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতিত নিপিড়ীত হচ্ছিল তিনি সর্বপ্রথম তাদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পঞ্চম, একক গ্রন্থাকারে তিনিই সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন সংকলণ করেছেন। ষষ্ঠ, তিনিই সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের নাম মুসহাফ রেখেছেন। সপ্তম, সর্বপ্রথম তিনি 'খলীফা রাশেদ' স্বীকৃতি পেয়েছেন। অষ্টম, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় সর্বপ্রথম হজ্জের আমীর নিযুক্ত হয়েছেন। নবম, রসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় সর্বপ্রথম নামাযে মুসলমানদের ইমামতি করেছেন। দশম, ইসলামে সর্বপ্রথম তিনি বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। একাদশ, তিনি ইসলামের প্রথম খলীফা যার জন্য মুসলমানরা বায়তুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করেছে। দ্বাদশ, তিনি সর্বপ্রথম খলীফা যিনি আপন স্থলাভিষিক্ত খলীফার নাম প্রস্তাব করেন। হযরত উমর (রা.)-কে তিনি মনোনীত করেছিলেন। ত্রয়োদশ, তিনি প্রথম খলীফা যার খিলাফতের বয়আতের সময় তার পিতা হযরত আবু কোহাফা জীবিত ছিলেন। চতুর্দশ, তিনি ইসলামের সর্বপ্রথম ব্যক্তি যাকে রসূলুল্লাহ (সা.) কোন উপাধি প্রদান করেছিলেন। পঞ্চদশ, তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার চার পুরুষ সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর পিতা আবু কোহাফা সাহাবী, হযরত আবু বকর স্বয়ং নিজে সাহাবী, তাঁর পুত্র হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর এবং তাঁর পৌত্র হযরত মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর; তাঁরা সকলেই সাহাবী ছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর হুলিয়া তথা দেহাবয়ব সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন অর্থাৎ তার বরাতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক আরবকে হেঁটে যেতে দেখেন আর তিনি তখন তার হাওদায় বসা ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য কাউকে হযরত আবু বকরের অধিক সদৃশ দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হযরত আয়েশার নিকট অনুরোধ করি, আপনি আমাদের নিকট হযরত আবু বকরের হুলিয়া তথা

দেহাবয়ব বর্ণনা করুন। এর উত্তরে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) ফর্সা মানুষ ছিলেন। হালকা-পাতলা গড়নের ছিলেন, গালে মাংস কম ছিল। কোমর সামান্য আনত ছিল, যার ফলে তার লুঙ্গিও কোমরে স্থীত হতো না বরং নিচের দিকে নেমে যেত। চেহারা ছিল স্বল্প মাংসল, অতটা ভরাট ছিল না। চোখ কোটরের ভেতরে ঢুকে থাকত এবং তার ললাট বা কপাল ছিল সুউচ্চ।

ইবনে সিরীন বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালেককে জিজ্ঞেস করি, হযরত আবু বকর (রা.) কি কলপ লাগাতেন? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, মেহেদী ও কাতাম গুল্মের মাধ্যমে নিজের চুল ও দাড়িতে কলপ লাগাতেন।

তাঁর খোদাভিতি এবং তাঁর তাকওয়া ও জগদ্বিমুখতা সম্পর্কে লেখা রয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সা.) হযরত রাবীয়া বিন জা'ফর ও হযরত আবু বকরকে কিছু জমি প্রদান করেন। একটি গাছ নিয়ে উভয়ের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) তর্ক-বিতর্কের সময় কোন কঠোর কথা বলে ফেলেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে এতে তিনি অনুতপ্ত হন এবং বলেন, হে রাবীয়া! তুমিও আমাকে এমন কোন কঠোর কথা বলে দাও যেন তা পূর্বের কথার প্রতিশোধ গণ্য হয়। কিন্তু তিনি এমনটি করতে অস্বীকৃতি জানান। তারা উভয়ে মহানবী (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। সব শুনে রসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, রাবীয়া! তুমি কঠোর কোন উত্তর প্রদান করো না। কিন্তু এ দোয়া কর, গাফারাল্লাহু লাকা ইয়া আবা বকর। অর্থাৎ হে আবু বকর! আল্লাহ্ তা'লা আপনার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন। হযরত রাবীয়া এরূপই করলেন। হযরত আবু বকর যখন এ কথা শুনেন তখন তার ওপর এর এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে ফিরে যান।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একটি পাখি দেখেন যা একটি গাছে বসে ছিল। তিনি বলেন, হে পাখি! তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ্র কসম! আমি যদি তোমার মত হতে পারতাম! তুমি গাছে বস, ফল খাও, এরপর উড়ে চলে যাও। তোমার কোন হিসাব-নিকাশ নেই আর কোন শাস্তিও নেই। আল্লাহর কসম! আমি যদি পথের পাশে থাকা একটি গাছ হতাম আর উট আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত আর আমাকে ধরে নিজের মুখে পুরে দিত আর দ্রুত আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত, এরপর উট আমাকে বিষ্ঠার ন্যায় বের করে দিত আর আমি যদি মানুষ না হতাম!

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা নাবার ৪১ নং আয়াত وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا অর্থাৎ কাফিররা বলবে হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম- এ আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন, কতিপয় মুসলমান সম্প্রদায় সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষে এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে যে তারা বলে, হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যুক্ষণে এই আয়াতই পড়তেন, তাই তার কুফুরী প্রমাণিত।

[অর্থাৎ তিনি পড়তেন, وَيَقُولُ الْكَٰفِرُ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًا (সূরা নাবা : ৪১); হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, কাফির বলতো কথাটা হবে না, ... তাই তিনি কাফের হয়ে গিয়েছেন, (নাউযুবিল্লাহ্)]। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অথচ রেওয়ায়েতটি যদি সঠিক হয়, [অর্থাৎ একথা যদি সত্য হয়] আর এ আয়াত যদি হযরত আবু বকর (রা.) সংক্রান্তও হয়ে থাকে, তাহলে হযরত আবু বকর (রা.)'র ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে (এ আয়াতের) অর্থ হবে, কাফেরদের কথার অস্বীকারকারী, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) বলবেন, 'হায়, আমার সাথেও যদি খোদা তা'লার আচরণ এমনটিই হতো!' অর্থাৎ তিনি যদি আমার পুণ্যকর্মের জন্য কোন পুরস্কার বা ভুলত্রুটির জন্য কোন শাস্তি না দিতেন! (এ অবস্থায়) এ বাক্যটি তো একজন খাঁটি মু'মিনের বাক্য (বলে প্রমাণিত হয়)। বিভিন্ন হাদীসে স্বয়ং মহানবী (সা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলতেন, আমি আমার কর্মের জোরে মুক্তি পাব না, বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুক্তি লাভ করব। কাফের শব্দটি এখানে কটাক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর এর অর্থ হলো, মানুষ তাকে কাফের বলে! যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে নিকটে থাকতেন এবং যিনি তার সমস্ত সম্পদ মহানবী (সা.)-এর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন আর ১১ বছরের মেয়েকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, অথচ তখন তার বয়স ছিল ৫৪/৫৫ বছর। এছাড়া হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন, সমগ্র মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে তিনি (সা.) কেবল আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পবিত্র কুরআন তাদের কটাক্ষ করে বলছে, এই কুরবানীকারী ব্যক্তি কাফের! অথচ সেসব লোক যারা তাঁর পুণ্যকর্মের বিপরীতে তুলনামূলক কোনো পুণ্যকর্মই করে দেখায় নি তারাই মু'মিন হওয়ার দাবি করে!

হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, হে আমার কন্যা! তুমি জান যে, সকল মানুষের মধ্যে তুমিই হলে আমার সবচেয়ে প্রিয়জন, আর আমি আমার অমুক জায়গার জমিটি তোমাকে হেবা বা দান করে দিয়েছিলাম। তুমি যদি তা দখলে নিতে এবং এর উৎপাদন থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে তাহলে অবশ্যই সেটি তোমার মালিকানায় থাকত, কিন্তু এখন তা আমার সকল উত্তরাধিকারীর মালিকানা। তাই আমি চাই, তুমি সেটি ফিরিয়ে দাও (অর্থাৎ সেই হেবা ফিরিয়ে দাও, কেননা তুমি এটি দখলে নাও নি আর আমার জীবদ্দশায় এ জমি আমার ব্যবহারাধীন ছিল;) যাতে সেটি আমার সব সন্তানের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনের শিক্ষা অনুসারে বণ্টন করা যায়, আর আমি যেন আমার প্রভুর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হতে পারি যে আমি আমার কোনো সন্তানকে অন্য সন্তানদের ওপর প্রাধান্য দেই নি। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে।

নিম্নোক্ত যে ঘটনাটি এখন আমি বর্ণনা করতে যাচ্ছি এর উল্লেখ ইতঃপূর্বেও হয়েছে, কিন্তু তাঁর গুণাবলী হিসেবেও এখানে আবার উল্লেখ করছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে যখন খিলাফতের চাদর পরিয়েছেন তখনকার ঘটনা। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরের দিনই যখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর দৈনন্দিন রীতি অনুসারে কাঁধে কাপড়ের থান উঠিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে হযরত উমর এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা বলেন, হে রসূলুল্লাহ্‌র

খলীফা, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, বাজারে যাচ্ছি। তখন তারা বলেন, আপনি হলেন মুসলমানদের শাসক! আপনি চলুন, আমরা আপনার জন্য একটি ভাতা নির্ধারণ করে দিই। [অর্থাৎ ফিরে চলুন; আমরা ভাতা নির্ধারণ করে দিব, ব্যবসা করার কোন প্রয়োজন নেই।]

আল্লামা ইবনে সা'দ ভাতার ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি দুটি চাদর পেতেন আর সেগুলো পুরাতন হলে তা ফিরিয়ে দিয়ে অন্য দুটি নিতেন। সফরের সময় বাহন এবং খিলাফতের পূর্বে যে খরচ ছিল সে অনুসারেই নিজের এবং পরিবারের জন্য ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) সমগ্র ইসলামী বিশ্বের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তিনি কী পেতেন? তিনি জনগণের অর্থের রক্ষক ছিলেন, কিন্তু এই অর্থের ওপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর (রা.) অনেক বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু তাঁর যেহেতু এমন অভ্যাস ছিল যে, তাঁর হাতে অর্থ আসতেই তিনি তা আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় উৎসর্গ করতেন, তাই মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি যখন খলীফা হন তখন তাঁর কাছে নগদ অর্থ ছিল না। খিলাফতের (আসনে সমাসীন হওয়ার) দ্বিতীয় দিনই তিনি বিক্রির উদ্দেশ্যে কাপড়ের পুঁটলি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথে হযরত উমর (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, আপনি এটি কী করছেন? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমাকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে; কাপড় না বেচলে খাবো কী? একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি তো হতে পারে না। আপনি যদি কাপড় বেচতে থাকেন তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব কে সামলাবে? হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, আমি যদি এ কাজ না করি তাহলে আমার সংসার কীভাবে চলবে? তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আপনি বায়তুল মাল থেকে সম্মানী ভাতা গ্রহণ করুন। উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তো এটি মেনে নিতে পারি না, বায়তুল মালে আমার কী অধিকার আছে? হযরত উমর (রা.) বলেন, যখন পবিত্র কুরআন এই অনুমতি দিয়েছে যে, ধর্মের সেবায় নিয়োজিত লোকদের জন্যও বায়তুল মালের অর্থ ব্যয় হতে পারে, তাহলে আপনি এই অর্থ কেন গ্রহণ করতে পারবেন না? অতএব এরপর বায়তুল মাল থেকে তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে সেই ভাতা কেবল সে পরিমান ছিল যে, তা দিয়ে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হওয়া সম্ভব হতো।

ইবনে আবি মুলায়কা বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র হাত থেকে লাগাম পড়ে গেলে তিনি (রা.) তাঁর উটনীকে বসিয়ে সেই লাগাম নিজেই তুলে নিতেন। তাঁকে বলা হয়, আপনার হাতে তুলে দেয়ার জন্য আপনি আমাদেরকে আদেশ দেন নি কেন? একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, **আমার প্রিয় মুহাম্মদ (সা.) আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমি যেন মানুষের কাছে কোন কিছু না চাই**। এবিষয়ে তিনি (রা.) এতটা সাবধানতা অবলম্বন করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একদা মসজিদে কিছু লোকের কথার শব্দ শুনতে পান। (তারা বলছিল,) **আবু বকর আমাদের ওপর** কিইবা **শ্রেষ্ঠত্ব রাখে? তিনি**

যেমন পুণ্যের কাজ করেন অনুরূপ পুণ্যকর্ম আমরাও করি। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, **হে লোক সকল! আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব তার নামায ও রোযার কারণে হয় নি, বরং (তার শ্রেষ্ঠত্ব) সেই পুণ্যের কারণে যা তার হৃদয়ে রয়েছে**। অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ে যে পুণ্য রয়েছে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার যে ভয় ও ভীতি রয়েছে- তা এমন মানের যা তাঁকে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে। এগুলো কেবল হৃদয়েই নেই, বরং এ অনুসারে তিনি কাজও করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র মর্যাদা এভাবে তুলে ধরেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত করতে থাক যতক্ষণ না তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে উপনীত হও আর সকল প্রতিবন্ধকতা ও অন্ধকারের পর্দা দূর হয়ে এই উপলব্ধি জন্মে যে, এখন আমি সেই সত্তা নই যা পূর্বে ছিলাম; বরং এখন তো নতুন দেশ, নতুন ভূমি, নতুন আকাশ আর আমিও নতুন কোনো সৃষ্টি। এই দ্বিতীয় জীবনকেই সূফীরা **'বাক্বা'** নামে অভিহিত করেন। মানুষ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয় তখন তার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার রূহ ফুৎকার হয়। তার প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। এই হলো সেই রহস্য যার ভিত্তিতে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন যে, যদি কেউ পৃথিবীতে বিচরণশীল লাশ দেখতে চায়, তাহলে সে যেন (হযরত) আবু বকর (রা.)-কে দেখে। হযরত আবু বকর (রা.)'র মর্যাদা তাঁর বাহ্যিক কাজকর্মের কারণেই নয়, বরং সে বিষয়ের কারণে যা তাঁর (রা.) হৃদয়ে বিরাজমান।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে কোনো এক সফরে বের হন এবং যাত্রাবিরতির পর তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যান। সবাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সাথে (যুক্ত হন)। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে তাঁবু গাড়ি। আমাদের সাথে এক গ্রাম্য বেদুঈনও ছিল। আমরা যে বেদুইনের ঘরে অবস্থান করি তাদের এক মহিলা সন্তানসম্ভবা ছিল। সেই বেদুঈন উক্ত মহিলাকে বলে, তুমি কি চাও যে তোমার ঘরে পুত্রসন্তান হোক? তুমি যদি আমাকে একটি ছাগল দাও তাহলে তোমার ঘরে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সেই মহিলা তাকে একটি ছাগল দিয়ে দেয়। সেই বেদুঈন ছন্দ মিলিয়ে কয়েকটি পংক্তি পাঠ করে। [মহিলার সামনে নিজের কোনো মন্ত্র পাঠ করে]। এরপর সে (বেদুঈন) তার ছাগল জবাই করে। (রান্না শেষে) মানুষ যখন আহারে বসে তখন এক ব্যক্তি বলে, আপনাদের জানা আছে কি, এই ছাগল কিভাবে লাভ হয়েছে? এরপর সে পুরো বৃত্তান্ত সবার সম্মুখে তুলে ধরতে গিয়ে বলে যে সে উক্ত মহিলার কাছ থেকে একথা বলে ছাগল নিয়েছিল যে, আমি দোয়া করলে তোমার গর্ভে পুত্রসন্তান হবে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) সেখানের লোকদের সাথে একত্রে বসে খাবার খাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং নিজ গলার ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে সেই খাবার বের করে দেন, অর্থাৎ

বমি করে এমন খাবার বের করে দেন। অর্থাৎ যে খাবার শির্‌কের ভিত্তিতে প্রস্তুত হয়েছে আমি তা গলধঃকরণ করতে পারি না।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র একটি কৃতদাস ছিল। সে তাঁকে (রা.) উপার্জন করে এনে দিতো এবং হযরত আবু বকর (রা.) তার উপার্জন থেকে খেতেন। একদিন সে কোনো একটি জিনিস আনে এবং হযরত আবু বকর (রা.) সেটি খেয়ে নেন। কৃতদাস বলল, আপনি কি জানেন এই খাবারের উৎস কী? হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কী? সে বলল, আমি অজ্ঞতার যুগে এক ব্যক্তির জন্য গণক হিসেবে কাজ করি । আমি তাকে প্রতারিত করেছি, কেননা গণনাবিদ্যা আমার ভালোভাবে রপ্ত ছিল না। তার সাথে সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে প্রতিদানস্বরূপ কিছু দেয়। অতএব, এটি সেই উপার্জন যেটি আপনি খেয়েছেন। [উপঢৌকন নিয়ে এসেছিল অথবা কখনো কখনো কিছু রান্না করে আনতো।] একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) নিজ হাত গলায় ঢুকিয়ে পেটে যা কিছু ছিল তার সবটা বমি করে ফেলে দেন এবং বলেন, আমার পক্ষে এমন হারাম খাবার খাওয়া সম্ভব না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ নিজ কাপড় হেঁচড়ে চলে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেবেন না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, (হে আল্লাহ্‌র রসূল!) আমি বিশেষ মনোযোগ না দিলে আমার কাপড়ের এক প্রান্ত ঢিলা থাকে। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তো অহংকারবশতঃ এমনটি কর না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একদা মহানবী (সা.) বলেন, যাদের লুঙ্গি (অহংকারের কারণে) নিচের দিকে ঝুলতে থাকে তারা জাহান্নামে যাবে। হযরত আবু বকর (রা.) একথা শুনে কেঁদে ফেলেন, কেননা তাঁর লুঙ্গিও এমনই ছিল। মহানবী (সা.) (সান্ত্বনা দিয়ে) বলেন, তুমি তাদের মাঝে নও। মোটকথা নিয়্যত এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব রাখে, আর বিষয় প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদার নিরিখে দেখতে হবে।

অতঃপর মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য, অনুবর্তিতা, রসূলপ্রেম এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য আত্মাভিমান প্রদর্শনের উল্লেখ (সম্বলিত হাদীস) রয়েছে।

একদিন হযরত আয়েশা (রা.) বাড়িতে মহানবী (সা.)-এর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন, ইত্যবসরে তার পিতা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) ঘরে আসেন। এ অবস্থা দেখে তিনি সহ্য করতে পারলেন না এবং নিজ কন্যাকে একথা বলে প্রহারে উদ্যত হলেন যে, তুমি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সামনে এভাবে কেন কথা বলছ!? মহানবী (সা.) এ অবস্থা দেখতেই পিতা ও কন্যার মাঝে এসে বাধা হয়ে দাঁড়ান এবং আবু বকরের সম্ভাব্য শাস্তির হাত থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-কে রক্ষা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন চলে গেলেন তখন মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)'র সাথে রসিকতা করে বলেন, দেখলে তো! আজ আমি তোমাকে তোমার পিতার হাত থেকে কীভাবে বাঁচিয়েছি? কিছুদিন পর হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় আসেন যখন কিনা মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.) হাসিমুখে কথা বলছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)

বললেন, তোমরা তোমাদের ঝগড়ায় তো আমাকে শরীক করেছিলে, এখন আনন্দেরও অংশীদার করো। এতে মহানবী (সা.) বলেন, আমরা শরীক করে নিলাম।

হযরত উকবা বিন হারেস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি দেখলাম হযরত আবু বকর (রা.) হযরত হাসান-কে কোলে নিয়ে বলছিলেন, আমার পিতা তোমার জন্য নিবেদিত। এ তো নবী (সা.)-এর চেহারা ও অবয়ব, আলীর চেহারা ও অবয়ব নয়! একথা শুনে হযরত আলী (রা.) হাসছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র কন্যা হযরত হাফসা যখন (নিজ স্বামী) হযরত খুনায়েস বিন হুযাফা সাহমী'র মৃত্যুতে বিধবা হয়ে যান। তিনি (অর্থাৎ হযরত খুনায়েস বিন হুযাফা) মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর মদীনায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে অবস্থায় হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলতেন, আমি উসমান বিন আফফান (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করে তার নিকট হযরত হাফসা'র বিষয়ে বলি, আপনি পছন্দ করলে হাফসাকে আপনার কাছে বিয়ে দিতে চাই। তিনি (রা.) বলেন, আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখব। অতঃপর আমি কয়েক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করি। তারপর হযরত উসমান (রা.) বললেন, আমার নিকট এ মুহূর্তে বিয়ে করাকে সমীচীন বলে মনে হচ্ছে না। হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর আমি তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বলি, আপনি যদি চান তাহলে আমি হাফসা'র বিয়ে আপনার সাথে করিয়ে দেই। তখন হযরত আবু বকর (রা.) চুপ হয়ে গেলেন এবং আমাকে কোনো উত্তর দিলেন না। হযরত উমর (রা.) বলেন, উসমানের তুলনায় আমি আবু বকরের কারণে বেশি মর্মাহত হই। এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করতে থাকি। অতঃপর মহানবী (সা.) হাফসাকে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন এবং আমি তাঁর (সা.) কাছে হাফসাকে বিবাহ দিই। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, সম্ভবত আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কেননা আপনি যখন আমার কাছে হাফসার কথা বলেছিলেন তখন আমি কোনো উত্তর দেই নি? আমি বলি, হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। তখন তিনি (রা.) বলেন, আসলে আপনি যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন সে বিষয়ে আপনাকে কোনো উত্তর দিতে যে বিষয়টি বাধা দিয়েছিল তা হলো, আমি জানতে পেরেছিলাম যে, মহানবী (সা.) হাফসাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করেছিলেন, আর আমি মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতে চাইছিলাম না; অর্থাৎ আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম না যে, মহানবী (সা.) তাকে বিয়ে করতে চান। একারণে আমি চুপ হয়ে গিয়েছিলাম বা অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। এরপর তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যদি তার সাথে বিবাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতেন তাহলে আমি অবশ্যই আপনার পক্ষ থেকে দেয়া আপনার মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত হতাম।

হযরত আবু বকর (রা.)-কে হযরত আলী (রা.)'র পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ করা সম্পর্কে লিখা আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সেসব লোকের মাঝে দণ্ডায়মান

ছিলাম যারা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করছিলেন এমতাবস্থায় যে, হযরত উমর (রা.)-কে খাটিয়ায় রাখা হয়েছিল। আর ঐ সময়ই আমি দেখতে পাই এক ব্যক্তি পেছন দিক থেকে এসে তার কনুই আমার কাঁধের ওপর রাখলেন আর বলতে লাগলেন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আমি তো আশা করতাম আল্লাহ্ তা'লা আপনাকেও আমাদের দুই বন্ধুর সাথেই সমাহিত করবেন। কেননা, আমি মহানবী (সা.)-কে একথা বহুবার বলতে শুনেছি যে, আমি, আবু বকর ও উমর অমুক জায়গায় ছিলাম; আমি, আবু বকর ও উমর এটি করেছি; আমি, আবু বকর ও উমর (সেখান থেকে) চলে যাই। এজন্য আমি এরূপ আশা পোষণ করতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকেও এঁদের দু'জনের সাথেই রাখবেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আর আমি পেছন ফিরে দেখি, তিনি ছিলেন হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.)।

এই স্মৃতিচারণ ইনশা'আল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)